স্টেট ফিসারী অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর
মৎস্যচাষ বিষয়ক পত্রিকা

মৎস্যকথন

বিশেষ ৩৩ তম দ্বিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলন সংখ্যা

উৎপাদন বৃদ্ধিতে গ্রাস কার্প ও আমূর

ড. অনিন্দ্য সুন্দর ঘোষ
যুগ্ম অধিকর্তা
মৎস্য দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বেশ কিছু বছর ধরে দ্রুত বর্দ্ধনশীল মাছ নিয়ে চাষিভাইদের মধ্যে উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। উৎপাদনশীলতা বাড়াতে কেবল মাছের ঘনত্ব বৃদ্ধি বা অন্যান্য ব্যবস্থাপনা যথেষ্ট নয়, সেই সঙ্গে সঠিক প্রযুক্তি চয়ন এবং উপযুক্ত চাষ পদ্ধতি প্রণয়ন করতে হবে। দ্রুত বর্দ্ধনশীল প্রজাতি হিসাবে পাঙ্গাস, তেলাপিয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু দেশীয় কার্প প্রজাতির মাছের সঙ্গে একই রকম চাষ পদ্ধতির বিচারে গ্রাস কার্প এবং কমন কার্প অত্যন্ত উপযোগী।

সারা বিশ্বের মৎস্য উৎপাদন মানচিত্রে প্রথম স্থানে রয়েছে গ্রাস কার্প। উপযুক্ত পরিবেশ ও সঠিক ব্যবস্থাপনায় বছরে তিন থেকে সারে তিন কেজি একটি মাছ হতে পারে। দ্বিতীয় কমন কার্প, তৃতীয় তেলাপিয়া চতুর্থ এবং পঞ্চম স্থানে যথাক্রমে কাতলা এবং রুই মাছ। সত্তরের দশকে চীন দেশ থেকে গ্রাস কার্প এবং সিলভার কার্প কল্যাণীর কুলিয়া ফার্মে তথা ভারতে প্রথম আসে। কমন কার্প কিন্তু বিভিন্ন ভাবে বহু সময় ধরে ভারত তথা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ছড়িয়ে পরেছে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে গ্রাস কার্প মাছটি বাঙালীর রসনাকে বোধ হয় সেভাবে তৃপ্তি করতে পারেনি। তাই উৎপাদন কম। দায়িত্বটা কিন্তু বর্তায় সব ধরনের মৎস্য বিজ্ঞানী, আধিকারিক, চাষী ভাই সকলের উপর। মনে রাখতে হবে রসনা তৃপ্তি ছাড়াও সস্তায় উন্নত প্রাণীজ প্রোটীনের যোগান বজায় রাখতে গ্রাস কার্প এবং কমন কার্পের জুরি নেই। এই মাছ দুটির বৃদ্ধি শীতেও খুব বেশী ব্যাহত হয় না। তাই উত্তরবঙ্গের পাহাড়ী অঞ্চলে ঝোড়ায় এদের চাষ যথেষ্ট জনপ্রিয়। ১৯৫২ থেকে ২০০২ এই ৫২ বছরে সারা বিশ্বে গ্রাস কার্প-এর উৎপাদন ৩৩৯ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সারা বিশ্বে গড় উৎপাদন ১০.১ শতাংশ এবং চীনে প্রায় ৯.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতে ১৯৯৩ সাথে সর্বাধিক উৎপাদন ছিল ১৩৭০০০ টন কিন্তু বর্তমানে তা ক্রম হ্রাসমান। গ্রাস কার্প শুধু দ্রুত বৃদ্ধিই পায়না এর খাদ্যে প্রোটীনের পরিমাণও কম লাগে। শাক সব্জীর খোসা, অব্যবহার্য ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ, একবীজপত্রী শষ্যের পাতা ইত্যাদি কুচিয়ে এদের খাদ্য হিসাবে প্রয়োগ করে (সাইজ ১১০-১৭০ গ্রাম) আপেক্ষিক বৃদ্ধির হার ৩.০ পর্যন্ত পাওয়া গেছে এবং প্রতিদিন দেহের গড় বৃদ্ধি ২.৮ শতাংশ পাওয়া গেছে যা রুই কাতলার তুলনায় অনেক বেশী। গ্রাস কার্পের সঙ্গে সচসংহত পদ্ধতিতে পশুখাদ্য চাষ করলে তা মাছের ও খাদ্য হিসাবে কাজে লাগতে পারে। আবার গ্রাস কার্পের খাদ্য নালী অপরিণত এবং পাকস্থলী না থাকায় পাচন ক্রিয়া সম্পূর্ণ না হয়েই খাদ্য পরিত্যক্ত হয় যা অন্য মাছ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। যে কোন মাছের ক্ষেত্রে FCR (Feed convertion ratio) দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। (১) খাদ্যের মান, (২) পরিপাক

তন্ত্রের ক্ষমতা। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে রুই, কাতলা, গ্রাস কার্প কারোরই পরিপাক তন্ত্র পরিণত নয়। একই খাদ্য খেলেও কাতলার বৃদ্ধি রুই এর থেকে বেশী, তার কারণ হল বংশগতভাবে কাতলা দ্রুত বর্দ্ধনশীল মাছ। আবর গ্রাস কার্পও হল এমন মাছ যা বংশগতভাবে দ্রুত বৃদ্ধি পায় যা সস্তা ও অনেক কম প্রোটীন যুক্ত খাবার খেলেও বৃদ্ধি কোন ভাবে প্রভাবিত হয়না। কম্পোজিট কালচারের ক্ষেত্রে মধ্য স্তরের খাদক হিসাবে ৩০ শতাংশ রুই এর জায়গায় ১৫ শতাংশ রুই ও ৫ শতাংশ গ্রাস কার্প বাধ্যতামূলক ভাবে ছাড়লে এবং যথেষ্ট পরিমাণ উদ্ভিজ্জ খাদ্য প্রয়োগ করলে কম পক্ষে প্রতি গ্রাস কার্প মাছ যদি ১ কেজি অধিক ওজনে বাড়লে প্রায় ১২-১৫ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। চীনের শীত প্রধান অঞ্চলে উৎপত্তি হওয়ায় তাপমাত্রা কমলেও এর বৃদ্ধি তেমন ব্যাহত হয় না।

দক্ষিণ বঙ্গের জেলা গুলিতে মূলতঃ বিল তথা বড় পুকুরে আগাছা নিয়ন্ত্রণেই গ্রাস কার্প ব্যবহৃত হয়। কিন্তু উপযুক্ত গুড়ি পানা, টোপা পানা ইত্যাদির যোগানের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে চারা পোনা উৎপাদন এবং ব্যাপক আকারে গ্রাস কার্পের চাষ বার্ষিক মৎস্য উৎপাদনকে এক লাফে অনেকটাই বাড়িয়ে দিতে পারে। স্বাদে ও গন্ধে গ্রাস কার্পের রুই এর সঙ্গে প্রায় কোন পার্থক্য নেই অথচ উপযুক্ত প্রচারের অভাবে মাছটি আজ ব্রাত্য। মনে রাখতে হবে "Egg Co ordination project" এবং "সানডে বা মনডে রোজ খাওয়া আনডে" এই স্লোগানের জোরে আজ পোল্ট্রি ডিমের চাহিদা আকাশ ছোঁয়া। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো গ্রাস কার্প এবং কমন কার্পের চাষ পদ্ধতি ভারতীয় মেজর কার্পের চাষ পদ্ধতি সম্পূর্ণ একই।

অপরদিকে কমন কার্পের মাত্র ৩০-৪০ গ্রাম ওজন এবং তিন মাস বয়সেই পেটে ডিম এসে যায়। আর সেই সঙ্গে বদ্ধ জলাশয়ে প্রজনন করে ও বৃদ্ধি তেমন হয়না। তৎসহ ঝোলা পেট হওয়ায় মাংসের পরিমাণ কম। এই কারণে মাছটি বঙ্গে জনপ্রিয় নয়। এর উন্নত ভ্যারাইটি হিসাবে আমুর মাছের কথা আমরা শুনেছি। বর্তমান আলোচনায় কমন কার্প ও আমুর কার্প মাছের বৃদ্ধি সংক্রান্ত একটি তুলনা মূলক চিত্র তুলে ধরা হবে। যাতে আমুর মাছটি ভবিষ্যত সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। উল্লেখ থাকে, এখানে চাষ পদ্ধতি নিয়ে খুব বেশি আলোচনার পরিসর নেই। কারণ পদ্ধতিটি একেবারেই কম্পোজিস্ট কালচারে পুকুরে নীচের স্তরের মাছ অর্থাৎ মৃগেল ও কমন কার্পের সমতুল। এছাড়া মাছটি মনোকালচারে কতটা উপযোগী হতে পারে কমন কার্পের সঙ্গে তার তুলনামূলক একটি তথ্যও এখানে আলোচিত হবে।

উত্তর রাশিয়ার আমুর নদী থেকে আমুর কার্পের উৎপত্তি। এসিয়ান কার্প সেন্টার থেকে আমুর Chaina type "*Cyprinus carpio haematopterus*" হিসাবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে পরে। পরবর্তীকালেতে রাশিয়ান ন্যাশনাল ফিসারিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে ১৯৮২ সালে FCRI এর জিনব্যাঙ্কে আনা হয়।

Institute of Aquaculture, Sterling University, Scotland এর সহযোগীতায় 'Karnata Veterinary, Animal and Fisheries Science University' একটি DFID প্রজেক্টে আমুর মাছের প্রজনন এবং বৃদ্ধির উৎকর্ষতা সংক্রান্ত বিষয়ে দীর্ঘ ১০ বছর গবেষণার পর যে Variety-টি develop করেছেন সেখানে আমুর কমন কার্পের ঝোলা পেট নেই এবং এক বছরের অঅগে প্রজণন অঙ্গের বৃদ্ধি হয়না তৎসহ মাছের দৈহিক বৃদ্ধি সাধারণ কমন কার্পের চেয়ে ২৭-৩৯ শতাংশ বেশী।

প্রথমেই জেনে রাখা ভালো এই ধরনের নতুন Variety তৈরী করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখলেন, বিভিন্ন প্রকার নিয়ন্ত্রিত প্রজননের পরীক্ষা করতে গিয়ে অধিক দৈহিক বৃদ্ধি যুক্ত আমুর অন্যান্য মাছের মত প্রজনন ক্ষমতা হারাচ্ছে না অর্থাৎ এদের নিজেদের মধ্যে প্রজনন করানো সম্ভব হচ্ছে কিন্তু পরবর্তী দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্ম থেকে দৈহিক স্বল্প বৃদ্ধি সহ পুরাতন বৈশিষ্ট্য গুলি আবার প্রকট হয়ে পরছে। এরপর তাঁরা Breeder Variety বলে পৃথক একটি Variety তৈরী করেন সেক্ষেত্রে এই সমস্যার সমাধান করা গেছে এবং Breeder Variety ই কেবলমাত্র মৎস্য বীজ উৎপাদন ব্যবহার করা উচিত। সেই কারণে দামেও দুটি Variety-র বিপুল পার্থক্য। ২০১৫ আর্থিক বছরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কল্যাণীর কুলিয়া গবেষণা সংস্থায় ২ গ্রাম ওজনের Grower এবং Breeder Variety যথাক্রমে ২ টাকা ও ৫০ টাকা প্রতি পিস হিসাবে 'KVAFU' ব্যাঙ্গালোর থেকে এনে বিভিন্ন Field Trial চালানো হয়।

মাছের বৃদ্ধির নানান দশায় এদের বৃদ্ধির হার পরীক্ষা করা হয়।

ধানী থেকে চারা পোনা : তিনটি বিভিন্ন পরিবেশ ধানী থেকে চারা তৈরীর জন্য ২ গ্রাম ওজনের Grower Variety-র ধানী কুলিয়া (কল্যাণী), জুনপুট (কাঁথি) এবং মিরিকের (দার্জিলিং) ঝোরায় যথাক্রমে ৩৫০০০/হেক্টর (Monoculture), ৩৫০০০/হেক্টর (Polyculture) এবং ৪০০০০/হেক্টর (Polyculture) তিন মাস কালচার করে যথাক্রমে ৮০-৮৫ গ্রাম, ৭০-৭২ গ্রাম ও ৫০-৫২ গ্রাম চারা পোনা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে তিনটি স্থানের গড় তাপমাত্রা যথাক্রমে ২৬°C, ২৭°C, ও ১৬°C ছিল।

চারা পোনা থেকে মার মাছ : চারা থেকে মার মাছও তিনটি বিভিন্ন পরিবেশে ৮০-৮৫ গ্রাম ওজনের কুলিয়া, বড়সাগরদীঘি (মালদা) এবং আলিপুরদুয়ারে যথাক্রমে ৭৫০০/হেক্টর, ৬০০০/হেক্টর এবং ৬০০০/হেক্টর এ ছাড়া হয়। নয় মাস পর যথাক্রমে ১০৫০ গ্রাম, ৯২০ গ্রাম এবং ৮৩০ গ্রাম গড় ওজনের মার মাছ পাওয়া যায়, এক্ষেত্রে তিনটি স্থানের গড় তাপমাত্রা ছিল ২৮°C, ২৫°C ও ২৩°C। আমুর মাছের ক্ষেত্রে প্রতিটি স্থানেই সর্বাধিক ও সর্বনিম্ন ওজনের অর্থাৎ একই পুকুরে বৈষম্যমূলক বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়।

অনুরূপ পরীক্ষা দেশী কমন কার্পের উপর ও চালানো হয় এবং প্রতি ক্ষেত্রে ওজন বৃদ্ধি অত্যন্ত সামান্য মানের হওয়ায় আমুরের সঙ্গে দৈহিক ওজন বা দৈঘ্যের তুলনা না করে দুটি মাছের মধ্যে

বৃদ্ধি সংক্রান্ত কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সূচকের তুলনা করব। মনে রাখতে হবে এই পরীক্ষা চলাকালীন প্রতিটি ক্ষেত্রে একইরকম পরিপূরক দানা খাদ্য প্রয়োগ করা হয়েছিল।

গুরুত্বপূর্ণ সূচক	ধানি থেকে চারা পোনা		চারা পোনা থেকে মার মাছ	
	আমুর কার্প	কমন কার্প	আমুর কার্প	কমন কার্প
গড় ওজন বৃদ্ধি (gm/d)	০.৯৯	০.৫৫	১.১২	০.৫৬
গড় দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি (cm/d)	০.১১	০.০৫	০.০৫	০.০২
আপেক্ষিক বৃদ্ধির হার (%) (Specific Growth Rate বা SGR)	১.২	১.০	০.৩৫	০.১৫

বৃদ্ধি সংক্রান্ত কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সূচকের তুলনামূলক মান :

এতক্ষণ আমরা Grower আমুর কার্প এর বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা করলাম। এবার Breeder আমুর কার্পের সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হয় Grower এর তুলনায় এর দৈহিক বৃদ্ধি কম। যেহেতু কার্প জাতীয় মাছ দু বছরের আগে প্রজনন করানো হয়না তাই দেখা গেছে ২ বছরে প্রায় ২-২.৫ কেজি স্ত্রী মাছ এবং ১.৮-২ কেজি ওজনের পুরুষ মাছ তৈরী হয় যা প্রজননের পক্ষে আদর্শ। মৎস্য প্রজননের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি সূচক হল প্রজনন অঙ্গের ও দেহের ওজনের অনুপাত (Gonado Somatic Ratio, GSR) এবং ফিকানডিটি (Fecundity) অর্থাৎ প্রতি কিলো ডিম এর সংখ্যা দেখা গেছে দুটি ক্ষেত্রেই আমুর কার্পের তুলনামূলক মান অনেক বেশী। যদিও প্রজননের পর নিষেক এর হার (Fertilization rate), ডিম ফোটার হার (Hatching rate) দুই প্রকার মাছের মধ্যে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। আমুর মাছ কমন কার্পের মত বছরে দু'বার জানুয়ারি এবং জুন-এ প্রজনন করে। এদিকে ভারতীয় মেজর কার্পের দক্ষিণ বঙ্গে এপ্রিল থেকে জুলাই ধানি পোনা পাওয়া গেলেও উত্তর বাংলায় বিশেষত পাহাড়ি অঞ্চলে চারা পোনা পেতে পেতে আগষ্ট-সেপ্টেম্বর হয়ে যায় এবং যথারীতি বৃদ্ধি ১০০-১৫০ গ্রামের বেশী হয়না। এক্ষেত্রে আমুর অত্যন্ত উপযোগী যদি ২-৩ মাস আগে Stock করা যায় এবং পরিক্ষিতভাবে বিভিন্ন ঝোরায় ৬-৮ মাসে ৩৫০-৪০০ গ্রাম ওজনের পাওয়া গেছে। কারণ হিসাবে আমুরের ধানী মে মাসেই পাওয়া যায় এবং মে-সেপ্টেম্বর ৫ মাস যখন তাপমাত্রা বেশী থাকে তার দৈহিক বৃদ্ধিও বেশী হয়। উত্তরবঙ্গে তথা পাহাড়ী অঞ্চলে আমুর মাছের উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে সরকারি এবং ব্যক্তিগত স্তরে এই মাছের চাষ বাড়াতে হবে। আমুর চাষের জন্য মৎস্য বীজ পেতে গেলে সরাসরি কর্নাটক প্রাণী ও মৎস সম্পদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্ম থেকে বা Central Institute of Fresh water Aquaculture, CIFA ভুবনেশ্বর এবং নিকটস্থ NFDB এর Brood Bank থেকে পাওয়া যেতে পারে। কল্যাণীর কুলিয়ায়

স্থিত রাজ্য মৎস্য দপ্তরের গবেষণা কেন্দ্র থেকে Breeder Variety-এর ধানী পোনা পাওয়া যেতে পারে। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু চাষী ভাই এই কেন্দ্র থেকে Breeder মাছ নিয়ে বড় করে প্রজননের মাধ্যমে ডিম পোনা তৈরী করেছেন।

সরকারি ফার্ম সহ বিভিন্ন চাষী ভাইদের পুকুর ৪০ শতাংশ কাতলা, ১০ শতাংশ রুই, ২০ শতাংশ গ্রাস কার্প, ২৫ শতাংশ আমুর ও ৫ শতাংশ মৃগেল কম্বোজিট পদ্ধতিতে চাষ করে গড়ে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে ৯-১০ টন/হেক্টর উৎপাদন হয়েছে।

ভারতবর্ষে গ্রাস কার্প উৎপাদনের যে সম্ভাবনা রয়েছে বর্তমানে তার ১৫ শতাংশ সাফল্য পাওয়া যায়নি। ওদিকে আমুর কার্প সম্পূর্ণ নতুন একটি Variety। তাই নিংসন্দেহে এই দুটি Major Carp নিয়ে নতুন করে ভাববার সময় এসেছে। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিই মূল লক্ষ্য হলে এবং রাজ্যবাসীর পাতে সহজলভ্য, উৎকৃষ্ট প্রাণীজ প্রোটীন এর যোগান বাড়াতে বেশ কিছু পরিকল্পনা নিতে হবে। গ্রাস কার্পের চাষ কম্পোজিট পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাপক হারে বাড়াতে হবে ও তৎসহ এ বিষয়ে ক্রেতা সচেতনা বাড়াতে সরকারি উদ্যোগে নিতে হবে। আমুর মাছ সম্পর্কেও ক্রেতার আগ্রহ বাড়াতে যত্নশীল হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আজকাল রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে বিভিন্ন জনপ্রিয় প্রোগ্রাম এর সাথে এই সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। সমস্ত প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া কে বিজ্ঞাপনের কাজে লাগানো যেতে পারে।

ইতিহাসের আলোয় মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ আধিকারিক

ড. কিশোর ধাড়া
উপমৎস্য অধিকর্তা
মৎস্য অধিকরণ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ শুধু নদীমাতৃক রাজ্য নয়, খাল-বিল-বাওর-দিঘী-পুকুর-ডোবা প্রভৃতি নানা পরিসরে জলা জমিতেও সমৃদ্ধ। ফলে বাঙালি 'মাছে- ভাতে' সমৃদ্ধ হবে এটাই প্রত্যাশিত। গ্রামীন বাংলার জলাভূমি রক্ষা এবং তা সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে বাঙালির রসনায় মাছের যোগান দেওয়াই রাজ্য মৎস্য দপ্তরের এক এবং অদ্বিতীয় লক্ষ্য। আর এই লক্ষ্য পূরণের অন্যতম মানবসম্পদ হলো এফ.ই.ও.(FEO)।

FEO -ফিশারি এক্সটেনশন অফিসার (Fishery Extension Officer)। গ্রামীন বাংলার বি ডি ও (Block Development Officer) অর্থাৎ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয়ে একজন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রসারণ আধিকারিক। আভিধানিক অর্থে FEO মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ আধিকারিক হলেও প্রমাদবশত মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক রূপে বহুল প্রচলিত। বর্তমানে FEO, AFO (Assistant Fishery Officer) এবং ARO (Assistant Research Officer) সম পর্যায়ভুক্ত হলেও সুদূর অতীতে রাজ্য মৎস্য দপ্তরে AFO পদটি FEO পদের পূর্বসূরী বা প্রবীণ। ভারত সরকারের তদানীন্তন গ্রামীণ ও সম্প্রদায় উন্নয়ন দপ্তরের (Rural and Community Development Department) অনুমোদনে ১৯৬৫-৬৬ সালে FEO পদের সৃষ্টি। বেতন ক্রম ১৭৫-৩২৫ টাকা। এর অনেক আগে থেকেই দপ্তরে AFO পদটি বর্তমান। তাদের বেতন ক্রম ১৫০-২৫০ টাকা। যাইহোক, FEO পদটি অনুমোদনের সাথে সাথেই AFO পদ থেকে ১৮ জনকে FEO পদে উন্নীত করা হয়। ঘটনাক্রমে তাদের অনেকেই শিক্ষাগত যোগ্যতায় স্নাতক ছিলেন না। কিন্তু ১৯৬৬ সালে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রথম ৮০ জনকে FEO পদে নিয়োগ করা হয়, যারা সকলেই স্নাতক ছিলেন। আর এদের নিয়োগ স্থল হয় ব্লক বা সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয়ে, মূলত: সম্প্রদায় উন্নয়ন ব্লক (Community Development or CD Block) গুলিতে। এই সময়কালে FEO-দের প্রথম মাসের বেতন ছিল ১৮২ টাকা ৫০ পয়সা। কিন্তু পদের শেষে আধিকারিক তকমা থাকার কারণে এই সময় থেকে পরবর্তী অনেক সময়কাল পর্যন্ত অনেকেই তুলনামূলক উচ্চ বেতন ক্রমের চাকরি অবহেলায় অগ্রাহ্য করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে চিত্ররূপ পরিবর্তিত হয়েছে- শিক্ষকতা সহ অন্যান্য বিভিন্ন সরকারি পদে FEO-রা পরিগমন করে চলেছেন।

যাইহোক, বিগত ষাট এবং সত্তরের দশকে রাজ্যে গ্রামীণ প্রশাসন স্তরে দুটি ঘটনা FEO-দের চাকরির ইতিহাসকে প্রভূতভাবে আন্দোলিত করে। একদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনায় কিছু ব্লকে প্রায়োগিক পুষ্টি অনুষ্ঠান (applied nutrition programme) ভুক্ত করা এবং অন্যদিকে তৃণমূল স্তরে মাছের কৃত্রিম প্রজননের (induced breeding) সার্বিক রূপায়ণে রাজ্য মৎস্য দপ্তরের সর্বাত্মক এবং সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ। রাজ্যে প্রথম দিনহাটা-২, ইংলিশ বাজার, বোলপুর-শ্রীনিকেতন, বারাসত-২, যাদবপুর সহ মোট আটটি ব্লক প্রায়োগিক পুষ্টি অনুষ্ঠান পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তীতে আরও ব্লককে অন্তর্গত করা হয়। সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকারের বহু অর্থ অনুদানরূপে আসতো এইসব ব্লকে মৎস্য চাষের জন্য। এর জন্য এইসব ব্লকে FEO-দের ছিল সেই সময়ের নিরিখে দামী, সুদৃশ্য জিপ গাড়ি এবং পেট্রোলের বরাদ্দ, যা ওই সময় অনেক BDO-দেরও ছিল না। BDO- রাও FEO-দের এই গাড়ি প্রশাসনিক কাজে ব্যবহার করতেন। FEO-দের অধীনে একজন করণিক এবং চারজন মৎস্য চাষী সহায়ক (Fishermen Attendant) ছিল তদানীন্তন ব্লক গুলিতে। যদিও পরবর্তীতে এই সরকারি অনুদান বন্ধ হয়ে যায়।

ঠিক এইরকমই সময়কালে ১৯৬৭-৬৮ সাল থেকে রাজ্যে মাছের কৃত্রিম প্রজননের উপর জোর দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে ১৯৬৫ সালে ১৯ শে জানুয়ারি মাননীয় কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী জি. সুব্রমনিয়াম- এর হাতে উদ্বোধন হয়ে গেছে কল্যাণীর মিঠে জলে মাছ চাষ গবেষণা কেন্দ্র (Freshwater Fisheries Research Station or FFRS)। মিরিক থেকে কল্যাণী ফার্ম পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে প্রায় সাড়ে ৩৫০ জলাশয় কে কেন্দ্র করে গবেষণার প্রশস্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত। মুখ্য ক্ষেত্র অবশ্যই মৎস্য প্রজনন। ব্যারাকপুরের কেন্দ্রীয় মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রের (ICAR-Central Inland Fishery Research Institute) মৎস্য বিজ্ঞানীদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে তখন চলছে প্রজনন ও চাষকে কেন্দ্র করে গবেষণার প্রসার। অন্যদিকে পরেশ চক্রবর্তী, শচীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী, সৌরেশ দে, রথীন সেনগুপ্ত, কান্ত কুমার বল, শ্যামল কুমার নিয়োগী, তপন গুহ রায় প্রমূখ কয়েকজন ছোট -বড় পদে আসীন মৎস্য আধিকারিকদের নেতৃত্বে মাঠে-ঘাটে-জলে তখন এই কর্মযজ্ঞের প্রয়োগ চলছে। এই ব্রিডিং দলে FEO—রাও ছিলেন। নৈহাটির প্রবাদ প্রতিম নীলু ঘোষ, মগরার চ্যাটার্জি ভাতৃদ্বয় সহ মৎস্যবীজ উৎপাদনে আজ যারা প্রথিতযশা, তাদের পথ দেখিয়েছেন এইসব আধিকারিকগণ। এই সময় বাঁকুড়া, হুগলি, অবিভক্ত মেদিনীপুর, বর্ধমান এবং ২৪ পরগনা প্রভৃতি জেলায় জেলায় বাছাই করা FEO নিয়ে দল/উপদল করে ইচ্ছুক মৎস্য চাষীদের পুকুরে মাছের কৃত্রিম প্রজনন করা হতো। এজন্য তাদের তিন-চার দিন সেখানে তাবু খাটিয়ে থাকতে হতো। পাশাপাশি মালদা, বহরমপুর, বর্ধমান, কল্যাণী, ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি সরকারি ফার্মেও এই সময় চলত মাছের প্রজননের বিশাল আয়োজন। FEO সহ অন্যান্য আধিকারিকদের তখন বিনিদ্র রজনী যাপনের পালা। এর বাইরেও তখন সমস্যা প্রচুর। প্রজননের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কোথায় পাওয়া যাবে? শিয়ালদহের পরিচিত বেডিং ব্যবসায়ী শৈললাল মনিলালের

দর্জিকে নানাভাবে বুঝিয়ে প্রথমবার হাপা সেট (hapa set) তৈরি করা গেল। আলগামেটেড সার্জিকাল (amalgamated surgical) দোকান থেকে ব্রিডিং-এর যন্ত্রপাতি এলো। পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের জন্য ৭/৮ জন FEO মিলে প্রথম দু-তিন বছর শিয়ালদহ, বৌবাজার, শ্যামবাজার এবং গড়িয়াহাট মাছের বাজার থেকে গ্ল্যান্ড সংগ্রহ করতে থাকেন। প্রতিদিন ভোর পাঁচটার সময় এই সমস্ত বাজারে পৌঁছতে হতো, দেরী হলে মৎস্য বিক্রেতারা মাছের মাথা দিতেন না। কারণ মানুষজন দেখলে সেই মাছের মাথা বিক্রি হতো না। এরপর বেলা বাড়লে তাদের নিত্যদিনের অফিস ডিউটিও করতে হত। এই সমস্ত কাজের জন্য ভ্রমণ ভাতা (Travelling allowance) অর্থাৎ টিএ ছিল ঠিকই তবে তা শুধু নগণ্য নয়, অপ্রতুলও। সে সময় বেসিক পে (Basic pay) অর্থাৎ মূল মাইনে দশ টাকা হলে টিএ ছিল ১৫ পয়সা। তবে এই সময় মাছের কৃত্রিম প্রজননের জন্য প্রথম পাঁচ বছর বেশ কয়েকজন FEO-কে সাম্মানিক অর্থ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এই সময় থেকে পরবর্তী বেশ কয়েক দশক পর্যন্ত FEO-দের আগ্রাতে নয় মাস, কোচিতে দেড় মাস সহ ব্যারাকপুর এবং পরবর্তীতে অধুনা মুম্বাইতে মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণে (স্নাতকোত্তর সমতুল্য মৎস্য বিজ্ঞানে ডিগ্রী DFSc অর্জনের জন্য) পাঠানো হয়েছে।

বিভিন্ন মেলায় মৎস্য দপ্তরের প্রদর্শন শুধু আজ নয়। ৭০-৮০র দশক থেকে ময়দানে এবং নানা স্থানে মেলায় প্রদর্শনের জন্য FEO-দের দায়িত্ব দেওয়া হতো। তবে মৎস্য দপ্তরের প্রচারের ভরকেন্দ্র সম্ভবত ছিল অন্যত্র। এই সময় প্রতিটি CD ব্লকে বছরে ২৭০০ টাকা বরাদ্দ ছিল উন্নত চাষীর পুকুরে চারা পোনা তৈরির জন্য। জেলায় বেশ কয়েকজন প্রকৃত মৎস্য চাষীকে ২০০ টাকা করে ঋণ দেওয়া হত। কিছু মৎস্যজীবীকে জাল প্রস্তুতির জন্য ২০০/২৫০ গ্রাম সুতো দেওয়া হত। চারা পোনা তৈরির জন্য একদিকে FEO-কে কলকাতার বড়বাজার অঞ্চল থেকে সার-খোল আনার দায়িত্ব নিতে হতো, তেমনি অনেককে দায়িত্ব নিতে হতো বাঁকুড়া থেকে রাত জেগে বড় গাড়িতে মাছের ডিমপোনা আনার। ইতিমধ্যে বিদেশ থেকে কল্যাণীর কুলিয়াতে তদানীন্তন মিঠাজলে মাছ চাষ গবেষণা কেন্দ্রে চলে এসেছে গ্রাসকার্প ও সাইপ্রিনাস কার্প। এই বিদেশী কার্পের বাচ্চাও মৎস্য চাষীদের মধ্যে বিলি করার অগ্রদূত ছিলেন দপ্তরের তৎকালীন তরুণ তুর্কি FEO-রা।

ইতিমধ্যে আবারও পটপরিবর্তন। ৮০'র দশকে একদিকে FEO-দের পদ পুরণে পাবলিক সার্ভিস কমিশন (PSC)-র মাধ্যমে নিয়োগ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অন্যদিকে ভারত সরকারের সহায়তায় বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক অনুদানে অন্তর্দেশীয় মৎস্য চাষ প্রকল্পের (Inland Fisheries Project or IFP) সূচনা। PSC-র মাধ্যমে FEO নিয়োগ পর্বে যোগ্যতা মান ন্যূনতম প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা কিংবা রসায়নবিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রী। এই অনুসারে প্রথম ব্যাচ ১৯৮৪ সালে। বহরমপুরে কেন্দ্রীয় অঞ্চলের উপ মৎস্য অধিকর্তার (তদানীন্তন ফিশারি

সুপারিনটেনডেন্ট) নির্দেশনায় বহরমপুর মৎস্যবীজ উৎপাদন কেন্দ্র (Fish Seed Farm) এবং কল্যাণীতে ১৯৮২ সালে নব সৃষ্ট রাজ্য মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (State Fisheries Training Centre or SFTC) চার মাসের প্রাক-চাকরি প্রশিক্ষণের (Pre-service Training) মধ্যে দিয়ে দপ্তরে আগমন ঘটলো নতুন FEO দের। যাইহোক ৮৪ এর পরে ৮৬ এবং ৮৮ সালের ব্যাচ। এদের প্রাক চাকরি প্রশিক্ষণ কল্যাণীতে। এরই মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্র বিজ্ঞান (marine science) সংক্রান্ত পঠন পাঠনকে কেন্দ্র করে ১৯৯০ সালে FEO নিয়োগেও যোগ্যতামানে প্রথমবার যুক্ত হয় সমুদ্র বিজ্ঞান বিদ্যার অভিজ্ঞান। এই অনুসারে ১৯৯০ সালে নিয়োগ হয় প্রথম পর্বে ২৮ জন এবং একই প্যানেল থেকে ১৯৯১ সালে ৫২ জন FEO (দু-দফায় ৩৫ এবং ১৭ জন)। এরপরেই ১৯৯৭ সালের ৬৫ জনের ব্যাচ। ঘটনাক্রমে এই দুটি পরপর ব্যাচে পাওয়া গেল এক ঝাঁক প্রাণিবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের। যাইহোক ৯৭-এর ব্যাচের FEO-দের প্রাক-চাকরি প্রশিক্ষণ কিন্তু বারাসাত মীনভবন ও জুনপুর রাজ্য মৎস্যপ্রযুক্তি কেন্দ্র (State Fish Technology Station or SFTS)-এ দুটি দলে হয়। কারণ এই সময়েই রাজ্যের নতুন প্রতিষ্ঠিত পশুপালন ও মৎস্য চাষ বিশ্ববিদ্যালয়ের (West Bengal University of Animal and Fishery Sciences) মৎস্য বিভাগের পঠন পাঠন চলছে কল্যাণীর SFTC-তে। পশ্চিমবঙ্গে পশুপালন ও মৎস্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও তার পঠন পাঠন FEO-দের ইতিহাসে এক ফলক স্বরূপ। কারণ ১৯৯৭ এর পরবর্তী FEO নিয়োগ ২০০৩ সালে। এই পর্ব থেকে চার বৎসর মেয়াদী মৎস্য বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি FEO নিয়োগের একমাত্র যোগ্যতা মান রূপে চিহ্নিত হয়। এই অনুসারে ২০০৩ -এর প্যানেল থেকে দুটি পর্বে মোট ৩৩ জন (২০০৩ ও ২০০৪ সালে ২২ ও ১১ জন যথাক্রমে) FEO নিয়োগ ঘটে। প্রথাগতভাবে প্রাক-চাকরি প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘটিয়ে ২০০৩ থেকে সূচনা হয় এক মাসের চাকরি কালীন প্রশিক্ষণ (In-service training)। এরপরে ২০০৬ -এর ৮৯ জন (দুই পর্বে ৪৫ ও ৪৪ জন), ২০১১ তে ৪৮ জন, ২০১৬-এর ৬৩ জন (তিন পর্বে ২০১৬,২০১৭ এবং ২০১৯ সালে যথাক্রমে ৪৫, ১৭ ও ১ জন) এবং সর্বশেষ ২০২২-এর ৩ পর্বে মোট ৯৮ জন FEO রাজ্য মৎস্য দপ্তরের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে।

মৎস্য দপ্তরের বিকাশ এবং প্রসার অনেক আগে শুরু হলেও নব্বইয়ের দশকের পর থেকে দেখা গেল এক অন্য আঙ্গিকের সমৃদ্ধশালী বিস্তার। এই পর্বে একদিকে দপ্তর তেমন নদীতে মৎস্য সঞ্চার প্রকল্প (river ranching programme) কিংবা মৎস্যজীবীদের জন্য গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় স্তরে স্বীকৃতি পাচ্ছে তেমনি অন্যদিকে দপ্তরে রঙিন মাছ, কাঁকড়া-চিংড়ি চাষে প্রভূত উদ্যোগ গ্রহণে সম্প্রসারিত হচ্ছে। একই সাথে চলছে সামুদ্রিক শৈবাল (marine algae) কিংবা কম্বোজ প্রাণী (molluscs like mussels, clam) চাষের ভাবনা চিন্তা। ইতিমধ্যে কল্যাণীর

মিঠে জলে মাছ চাষ গবেষণা কেন্দ্র রঙিন মাছের বিশেষত গোল্ডফিশ, এঞ্জেল, কৈ কার্প, বিভিন্ন লাইফ বেয়ারার (live bearer like guppy, moly, platy etc.) মাছের প্রজনন তথা চাষ নিয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণে দেশের প্রথম সারিতে উঠে এসেছে। প্রসঙ্গত কল্যাণীর এই গবেষণা কেন্দ্রে তৎকালীন মিঠে জলে মুক্তো চাষ (freshwater pearl culture) সংক্রান্ত গবেষণা দেশের মধ্যে তখন একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয়। অন্যদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার পৈলানে গড়ে উঠেছে মৎস্য সম্বন্ধীয় অনুজীব ও পরজীবী (microbiology and parasitology) সংক্রান্ত গবেষণা কেন্দ্র। সেখানকার ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া সংক্রান্ত গবেষণার পরিকাঠামো সমসাময়িক যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল্য ছিল। কল্যাণীর গবেষণা কেন্দ্রে এই সময় দেশী মাগুরের প্রজননের সাফল্য এক যুগান্তকারী ঘটনা। আজও এদেশে দেশী মাগুরের প্রজনন সংক্রান্ত গবেষণা পত্রে কল্যাণীর তৎকালীন মৎস্য আধিকারিকদের গবেষণাপত্রের উল্লেখ নিদর্শ স্বরূপ। এ সমস্ত সাফল্যের কারিগর নিঃসন্দেহে সংশ্লিষ্ট FEO-রা। তাদের নিরলস প্রচেষ্টা এবং পরিশ্রম রাজ্যের মৎস্য দপ্তরকে ক্রমশ প্রচারের আলোয় নিয়ে আসে। FEO দের নেতৃত্বে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির ক্রমান্বয়ে জলার উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কেন্দ্রীয় স্তরের স্বীকৃতি দপ্তরের সম্প্রসারণের সাফল্যকে চিহ্নিত করে। ১৯৯৮ সালে মুকুটমণিপুর জলাধারে মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হল খাঁচায় মাছ চাষ। ভারতবর্ষে সম্ভবত কোন রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এটিই প্রথম খাঁচায় মাছ চাষের সূচনা। উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সাথে বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ার নিকটবর্তী ব্লকের কয়েকজন FEO এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়।

ঠিক এইরকমই এক পরিস্থিতিতে মৎস্য দপ্তরের পরিকাঠামোগত পরিবর্তনও একই সাথে লক্ষণীয়। সাধারণভাবে আমাদের রাজ্যে মিঠে জল উৎসের প্রায় ৭০ শতাংশ চাষযোগ্য (culturable), কুড়ি শতাংশ অর্ধ অনুৎপাদক (semi-derelict) এবং বাকি ১০% অনুৎপাদক (derelict)। সংস্কারের মাধ্যমে এই ৩০% জলাকে চাষযোগ্য করে তোলা এবং চাষযোগ্য জলার উৎপাদনের প্রভূত বৃদ্ধি (তৎকালীন উৎপাদন ৬০০ থেকে ৮০০ কেজি / হেক্টর / বৎসর থেকে লক্ষ্য মাত্রা ২৫০০-৩৫০০ কেজি / হেক্টর / বৎসর) সামনে রেখে ১৯৮০-৮১ সালে বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় রাজ্যে গঠিত হয় মৎস্য চাষী উন্নয়ন সংস্থা (Fish Farmer's Development Agency or FFDA)। একদিকে হাজা-মজা জলাভূমি সংস্কার, তা মাছ চাষের আওতায় আনা এবং মাছ চাষের মাধ্যমে জলার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সূচনা হয় অন্তর্দেশীয় মৎস্য চাষ প্রকল্প। প্রকল্পের অধীনে মাছ চাষীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও থাকে। অন্যদিকে প্রতিটি জেলায় মৎস্য দপ্তরের নিজস্ব কার্যালয় "মীন ভবন" স্থাপন এবং রাজ্য স্তরে রাজ্য পরিকল্পনা ইউনিট (State Plan Unit or SPU) গঠন হয়। সৃষ্টি হয় অতিরিক্ত মৎস্য অধিকর্তা (Additional Director of Fisheries, SPU) পদের। পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস (WBCS) থেকে আগত আধিকারিকদের জন্য সংরক্ষিত এই পদটি বর্তমানে আমাদের দপ্তরে অতিরিক্ত মৎস্য অধিকর্তা,

প্রশাসন (Additional Director of Fisheries, Administration) রূপে বহুল পরিচিত। পাশাপাশি জেলা স্তরে মাননীয় সভাধিপতিদের সভাপতি (Chairman) এবং জেলা শাসকদের নির্বাহী সহ-সভাপতি (Executive Vice-Chairman) রূপে চিহ্নিত করে FFDA- এর জন্য একটি পরিচালন মন্ডলী (Managing Committee) গঠন করা হয়। FFDA-র অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য দপ্তর থেকে মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক (Chief Executive Officer), প্রশিক্ষণ নিরীক্ষক (Training Superintendent) এবং FEO এই সংস্থায় নিয়োগ করা হয়। শুধু পুকুরে মাছ চাষ নয় পরবর্তীতে চৌবাচ্চায় রঙিন মাছের চাষ এবং পাহাড়ি ঝরনা অর্থাৎ ঝোরায় মাছ চাষও FFDA-এর প্রকল্পের অধীনে আনা হয়। বস্তুত একসময় এই FFDA-র প্রকল্প রূপায়ণকে কেন্দ্র করে দপ্তরের সর্বস্তরে এক উদ্দীপনা তৈরি হয়ে ছিল। সংস্থার আর্থিক আনুকুল্য এবং গাড়ির উপস্থিতি তখন অন্য দপ্তরের কাছেও ঈর্ষণীয়। সাধারণ মাছচাষী তখন জেলা মৎস্য দপ্তর বলতে FFDA কেই বুঝত। ১৯৯৮-৯৯ সাল পর্যন্ত এই FFDA-এর প্রকল্প রূপায়ণের জন্য কর্মযজ্ঞের মূল যাজ্ঞিক ব্লকের FEO-দের বিশেষ ভাতা (allowance) দেওয়ায় বন্দোবস্ত ছিল। তবে এখন FFDA-র সেই পুরাতন উজ্জ্বল্য বজায় না থাকলেও জেলায় সহ মৎস্য অধিকর্তা এবং মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকদের নেতৃত্বে FEO-দের বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে বিশেষত সাম্প্রতিক ময়না মডেল (Moyna Model), বড় আকারের মাছ উৎপাদন (Big Fish Culture), জল ধরো জল ভরো প্রকল্পের অধীনে নির্মিত জলাশয়ে মাছ চাষ, মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড (MJCC), মৎস্যজীবী নিবন্ধীকরণ (Fishermen registration), মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠী (Fish Production Group or FPG) গঠন প্রভৃতির ক্ষেত্রে FEO-দের ভূমিকা প্রশংসনীয়।

(তথ্যসূত্রের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার : শ্রী তপন গুহ রায়, প্রাক্তন সহ মৎস্য অধিকর্তা)

ঝোরা পোখরি — মা মাছা পালন

শুভব্রত চট্টোপাধ্যায়
জেলা মীনাধিকারিক
যুগ্ম অধিকর্তার (এম.ই.এম.এস.) করণ, মৎস্য দপ্তর

গ্রামীন পাহাড়ের আর্থ সামাজিক বিকাশ, অপুষ্টি নির্মূল ও রোজগারের দিশা দেখাতে মাছ চাষ নতুন দিগন্তের হাতছানি দিচ্ছে। সমতলের মত নয়— পাহাড়ের মাছ চাষের প্রযুক্তির নাম 'ঝোড়ায় মাছ চাষ'। দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলায় বহু মানুষ এই চাষে যুক্ত। মাথা পিছু প্রোটিনের চাহিদার অনেক অংশ এই মাছ পূরণ করছে।

(ক) ঝোরা ফিশারীর ইতিহাস : ১৯৮১ সালে পাহাড়ের মানুষের জন্য মৎস্য দপ্তর; পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাত ধরে এর পথ চলা শুরু। প্রাথমিক ভাবে পরীক্ষামূলক ভাবে ৯(নয়টি) প্রদর্শন ক্ষেত্রে শুরু হয় এবং সফলতা লাভের পর (নয় মাস নির্দিষ্ট ভাবে কাজ করে) হেক্টর পিছু ৭.৫-৯.০ টন হিসাবে উৎপাদন পাওয়া যায়। এবং ঐ সাফল্য দপ্তর তথা জনগণের মধ্যে উৎসাহ ছড়ায় এবং মৎস্য চাষ উন্নয়ন সংস্থার ৫০% শতাংশ অনুদান সহ প্রকল্পের যাত্রা শুরু হয়।

(খ) ঝোরা পোখরি-র খুঁটি নাটি :

(১) স্থান নির্বাচন ও মাটির চরিত্র : পাহাড়ে সারা বৎসর প্রবাহমান ঝর্ণার নিকটবর্তী স্থান আদর্শ। ঐ জলের ধারা ঝোরায় সারা বছর প্রবাহমান জলের সংস্থান করে। যেহেতু পাহাড়ে বিস্তীর্ণ সমভূমি পাওয়া যায় না তাই এর আয়তন হয় ৫০০-৫৫০ বর্গ ফিট। এবং এর অবস্থান বাড়ির নিকটবর্তী অথবা সব্জী ক্ষেত্রের কাছে। তাই এর অপর নাম 'কিচেন পন্ড'। মাটি বালি-দোঁয়াশ হবে ভালো। না হলে টার্পোলিন শিট বিছিয়ে দিতে হয় পুকুরের জলধারণ ক্ষমতা ঠিক রাখার জন্য। অথবা সিমেন্টের চৌবাচ্ছা করলে খুবই ভালো হয়।

(২) পুকুর তৈরী : সাধারণতঃ পুকুরের মধ্যবর্তী স্থান গভীরতর ও আস্তে আস্তে পার্শ্ববর্তী স্থান কম গভীর করা হয়। তবে মধ্যস্থল ১ মিটারের কম গভীরতা সম্পন্ন হয়। এর অধিক গভীরতা হলে জলের তাপমাত্রা খুবই নেমে যায় ফলে মাছ মারা যায়, আবার খুব কম গভীর হলে মৎস্যভূক পাখীর উপদ্রব হয়।

(৩) জল সরবরাহ : ঝর্ণার জল একটু উচ্চতা থেকে পুকুরে পড়বে, ফলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বেশী হবে। জল বর্হিগমনের ব্যবস্থা এমন হতে হবে যাতে লাগাতার জল বেরিয়ে যাবে এবং বর্ষণের ফলে পাড় ভাঙবে না অথচ অতিরিক্ত জল বের হয়ে যাবে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ঝোরার জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা অধিক কিন্তু পরিপোষক পদার্থের পরিমান খুবই কম।

(৪) মাছ নির্বাচন ও ঘনত্ব — বিভিন্ন মাছের মিশ্রণে চাষ করা হয় যেমন - ঘেসো রুই (টিনোফেরিঙ্গোডন ইডেলা), রুপোলী রুই (হাইপোথ্যালমিক মলিট্রিক্স)। এই দুই বিদেশী প্রজাতির সঙ্গে দেশজ পাহাড়ী নদীর মাছ যেমন কাত্‌লি (নিওলিসোচিলাস হেক্সাগোনোলেপিস্), আসলা (সিজোথোরাক্স

রিচার্ডমনি), মহাশের (টর পুটিটোরা) যুক্ত করা যায়। মজুত ঘনত্ব উচ্চ নয়, হেক্টর পিছু প্রায় ১৫০০০-২০০০০ চারা প্রায় ৭-৮ সেমি সাইজের। মার্চ-অক্টোবর এই আটমাস হচ্ছে পালন কাল। রুই (লেবিও রোহিতা), কাতলা (কাতলা কাতলা) ও মৃগেলের (সিরহিনাস মৃগেলা) বৃদ্ধি তুলনামূলক ভাবে কম হয়। বিদেশী মাছ যেখানে ৫০০-৬০০ গ্রাম, পাহাড়ী প্রজাতি ২৫০-৩০০ গ্রাম ওজনের হয় সেখানে রুই/কাতলা/মৃগেল ৫০-৬০ গ্রাম হয় ৮ মাসে, এর কারণ নিম্ন তাপমাত্রা।

(৫) খাদ্য ও তালিকা : যেহেতু ঝোরার জল প্রাকৃতিকভাবে কম উৎপাদনশীল তাই পরিপূরক খাদ্যের উপর বেশি নির্ভরশীল এই চাষ। 'হালাহালা' পাতা, কলাপাতা, স্কোয়াশপাতা হল গ্রাসকার্পের খাবার। অন্যান্য মাছ কুঁড়ো, সয়াবিন গুঁড়ো, কিচেন ওয়েস্ট ও প্রাণীজ মাংসের বর্জ্য অংশ ভক্ষণ করে। বর্তমানে প্যালেটেড ফিড ও ম্যাস বহুল ব্যবহৃত।

মাছের খাদ্য প্রয়োগ তাপমাত্রার ওঠানামার সঙ্গে পরিবর্তনশীল।

১৫° — ১৮° সে তাপমাত্রায় ওজনের ২%

১৮° — ২১° সে তাপমাত্রায় ওজনের ৩%

২১° — ২৪° সে তাপমাত্রায় ওজনের ৫%

২৪° সে এর ঊর্দ্ধে ৫%

(৬) পুকুর পরিচর্যা : জলের গভীরতা নিয়ন্ত্রণ, ভুক্তাবশেষ অপসারণ ও শত্রুদের থেকে মাছকে রক্ষা করা। শত্রু বলতে সাপ, ভোঁদড় ও মৎস্যভুখ পাখীদের আটকাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

(৭) ফসল তোলা : শীতে যেহেতু মাছের বৃদ্ধি থমকে যায়, তাই অক্টোবরের শেষে মাছ তোলা হয়। মাছ ধরার পদ্ধতি খুবই সহজ। প্রথমে জল ঢোকার পথ বন্ধ করে বর্হিগমনের পথ খুলে দিলে সহজেই জলহীন পুকুর থেকে মাছ সংগ্রহ করা হয়। যেহেতু এগুলি আকারে ছোট তাই মাছচাষী একক প্রচেষ্টাতেই তাঁর ফসল ওঠাতে পারেন। পাহাড়ে এই মাছের খুবই চাহিদা আছে। কেজি প্রতি ২০০-৩০০ টাকা সহজেই পাওয়া যায়।

(৮) সীমাবদ্ধতা : নিম্নলিখিত সীমাবদ্ধতা পূর্বে ছিল—

(ক) পুকুর তৈরীর পুঁজি

(খ) প্রশিক্ষণ

(গ) মাছের চারা পাওয়ার নিশ্চয়তা

(ঘ) মাছ পালনের পুঁজি

(৯) সোনালী দিশা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রামীন অর্থনীতির বিকাশের লক্ষ্যে, পাহাড়ের অর্থনৈতিক মানবৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত জরুরী ও অতীব কার্যকরী কিছু পদক্ষেপ মৎস্য দপ্তরের মাধ্যমে নেওয়ার ফলে উপরোক্ত সীমাবদ্ধতা গুলি দূরীভূত হয়েছে।

যুগান্তকারী একটি সিদ্ধান্ত মাছচাষীদের জন্য কিষাণ ক্রেডিট কার্ড প্রবর্তনের ফলে চাষীভাই গণ সহজ শর্তে পুঁজির সংস্থান করতে পারছেন।

মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে মাছচাষীদের সচেতনতা শিবির করে একাধারে প্রশিক্ষণ ও কিষাণ ক্রেডিট কার্ড সম্বন্ধে ওয়াকিবহল হচ্ছেন।

অন্তঃপ্রজাতীয় হেটেরোসিস এবং মাছ চাষে এর প্রয়োগ

পীযুষ কান্তি দাস
জেলা মীনাধিকারিক (শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ), দার্জিলিং

জীবদের (organisms) অন্তঃপ্রজাতীয় প্রজননের (intraspecific breeding) ফলে সৃষ্ট বংশধরে (progenies) সবাই তাদের জনিতা বা পিতা-মাতার মতো হয় না, বরং এক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন জীনগত বৈশিষ্ট্যের (genetic feature) নিরিখে তাদের পিতা-মাতার চেয়ে বেশী তেজস্বী বা প্রাণশক্তি সম্পন্ন (vigor) ও উৎকর্ষ মানের হয়। তাই জীনগত বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রের (genetic trait & character) মানোন্নয়নের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য পিতা-মাতার নির্বাচন (selection) সঠিকভাবে করে তাদের মধ্যে প্রজনন (breeding) ঘটানো হয়। মৎস্যচাষীরা এই ব্যাপারটা মাথায় রাখলে তারা সঠিক ও উন্নত গুণসম্পন্ন মাছের চারা উৎপাদন করতে সক্ষম হবেন এবং মাছের উৎপাদনও বাড়াতে পারবেন।

অন্তঃপ্রজাতীয় হেটেরোসিস কি?

ভিন্ন চরিত্র সম্পন্ন দুটি সম-প্রজাতির জীবের মধ্যে (intraspecific) প্রজননের ফলে প্রথম অপত্য বংশে (F1 জনু) যে অপত্য বা বাচ্চা (offspring) উৎপন্ন হয়, তার সতেজতা, বৃদ্ধি, আয়তন, রঙ ইত্যাদি পিতা-মাতা বা জনিতা জীবের থেকে বেশী হয় এবং পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার ক্ষমতাও বেশী থাকে। এক্ষেত্রে প্রতি জনুতেই চরিত্রের উৎকর্ষতা পরিলক্ষিত হয় এবং এরকমভাবে বেশ কয়েক জনু (generations) অতিক্রম করার পর উল্লিখিত চরিত্রগুলির লক্ষ্যণীয় উৎকর্ষ সাধন ঘটে। এই ঘটনাকে অন্তঃ প্রজাতীয় হেটোরোসিস বলে। এটি হলো এক ধরণের নির্বাচনের মাধ্যমে প্রজনন (selective breeding)। এটি প্রাকৃতিক ভাবে (naturally) অথবা প্রণোদিত ভাবে (induced) হতে পারে।

তবে মাছের ব্যাপারে একটা বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। তা হল, একই বাসস্থান (physical habitat) বা পুকুরের অন্তর্গত সম-প্রজাতির মাছেদের ক্ষেত্রে পর পর জনুতে (generation after generation) যদি এরকম হয় তাহলে অন্ত-প্রজনন বা inbreeding ঘটবে এবং সেক্ষেত্রে হেটেরোসিসের উল্টো প্রভাব (reverse effect) পড়বে অর্থাৎ উৎকর্ষতা হ্রাস পাবে। তাই প্রতি জনুতে প্রজনন ঘটানোর সময় পৃথক পৃথক বাসস্থানে অবস্থিত সম-প্রজাতির মৎস্যগোষ্ঠী (founder populations of fish) থেকেই পিতা-মাতা নির্বাচন করতে হবে।

হেটেরোসিসের কারণ ?

ধরা যাক, জীবের একটি বৈশিষ্ট্যের (trait) অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের (characters) জন্য দায়ী প্রকট (dominant) অ্যালিল হল A এবং প্রচ্ছন্ন (recessive) অ্যালিল হল a [অ্যালিল হল জীনের ভিন্ন ভিন্ন বিকল্প রূপ]।

সুতরাং এক্ষেত্রে AA ও aa হল বিশুদ্ধ হোমোজাইগোট এবং Aa হল সংকর হেটেরোজাইগোট।

AA অথবা aa এর ক্ষেত্রে যে-কোনো একটি অ্যালিল জোড়ায় (paired) থাকে, কিন্তু Aa এর ক্ষেত্রে দুটি অ্যালিলই একক (single) ভাবে থাকে। AA অথবা aa এর ক্ষেত্রে একই ধরনের অ্যালিল অপেক্ষা

Aa এর ক্ষেত্রে দুই ধরণের অ্যালিল থাকায় এই Aa হেটেরোজাইগোটে বিপাকীয় প্রাধান্য (metabolic advantage) ঘটে যার ফলই (result) হল হেটেরোসিস। এটি অধিক প্রকটতা প্রকল্প (overdominance hypothesis) নামে পরিচিত। প্রকট অ্যালিল (A) প্রচ্ছন্ন অ্যালিলের (a) থেকে উৎকর্ষ এবং প্রকট অ্যালিলই হেটেরোসিস ঘটায়। একে প্রকটতা প্রকল্প (dominance hypothesis) বলে।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, হেটেরোজাইগোটের উৎকর্ষতাই হল হেটেরোসিসের প্রধান কারণ (যদিও এই ব্যাপারে কিছু বিতর্ক আছে)।

হেটেরোসিস কি ভাবে ঘটে?

আমরা জানি, রুই মাছের (*Labeo rohita*) আঁশের লালচে ভাব (red pigmentation of scales) এবং সুঠাম চেহারা অর্থাৎ উত্তম বাড়-বাড়ন্ত (well growth) মৎস্য ক্রেতাদের কাছে আকর্ষণীয়। এই চরিত্রগুলির মধ্যে একটি চরিত্রকে (character) আমরা এখানে বিবেচনা করলাম। তা হল আঁশের লালচে ভাব। তাই ধরা যাক, দুটি জনিতা (পিতা-মাতা) বিশুদ্ধ হোমোজাইগাস রুই মাছের একটির জীনোটাইপ DDrrHH এবং অপরটির ddRRhh যেখানে D>d, R>r ও H>h অর্থাৎ D, R ও H হল প্রকট অ্যালিল (dominant alleles) এবং d, r ও h হল প্রচ্ছন্ন অ্যালিল (rescessive alleles)। প্রকট অ্যালিলগুলি D, R ও H প্রত্যেকে রুইমাছের আঁশের রঙ লালচে হওয়ার জন্য ৩০% করে দায়ী এবং প্রকট অ্যালিলের অনুপস্থিতিতে প্রচ্ছন্ন অ্যালিলগুলি d, r ও h প্রত্যেকে ঐ চরিত্রের জন্য ১৫% করে দায়ী।

এখন, P জনু বা জনিতা বা পিতা-মাতার ক্ষেত্রে—

পিতা রুইমাছ = DDrrHH, যেখানে প্রকট অ্যালিল = D + H = ৩০% + ৩০% = ৬০% আঁশ লালচে হওয়ার জন্য দায়ী এবং প্রচ্ছন্ন অ্যালিল = r = ১৫% আঁশ লালচে হওয়ার জন্য দায়ী। সুতরাং, এই পিতা বা পুরুষ রুইমাছে (৬০% + ১৫%) বা ৭৫% আঁশ লালচে।

আবার, **মাতা রুইমাছ** = ddRRhh, যেখানে প্রকট অ্যালিল = R = ৩০% আঁশ লালচে হওয়ার জন্য দায়ী এবং প্রচ্ছন্ন অ্যালিল = d+h = ১৫% + ১৫% = ৩০% আঁশ লালচে হওয়ার জন্য দায়ী। সুতরাং, এই মাতা বা মেয়ে রুইমাছে (৩০%+৩০%) বা ৬০% আঁশ লালচে।

এরপর, পিতা রুইমাছ ও মাতা রুইমাছের মধ্যে প্রজনন ঘটানো হল এবং F1 জনু বা প্রথম অপত্য জনু বা প্রথম বংশধর তৈরী হল, যেখানে পিতা রুইমাছ থেকে আসবে D, r ও H অ্যালিলগুলি এবং মাতা রুইমাছ থেকে আসবে d, R ও h অ্যালিলগুলি। ফলে তাদের বাচ্চাদের বা প্রথম অপত্য জনুর রুইমাছের জীনোটাইপ হবে DdRrHh এবং এখানে সব অ্যালিল-জোড়ের ক্ষেত্রেই (Dd, Rr ও Hh) প্রকটতা প্রকাশ পাবে। এক্ষেত্রে, তিনটি প্রকট অ্যালিলই = D + R + H = ৩০% + ৩০% + ৩০% = ৯০% আঁশ লালচে হওয়ার জন্য দায়ী।

অতএব, এটি স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান যে, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের (traits) নিরিখে অন্তঃপ্রজাতীয় হেটেরোসিসে অপত্য বা বাচ্চাদের চরিত্র (character) তাদের বাবা-মায়ের চেয়ে বেশী উৎকর্ষ মানের হয়।

মাছ চাষে হেটেরোসিসের প্রয়োগগত ফল :

১) মাছ চাষে হেটেরোসিসের প্রধান ফল হল পরিমাণগত (quantitative) ও গুণগত (qualitative) — যে কারণে মাছের ফলন (yield) বৃদ্ধি পেতে পারে এবং মাছের বাহ্যিক গঠন ও রূপ ইত্যাদি চারিত্রিক মানের উৎকর্ষ সাধন ঘটতে পারে।

২) হেটেরোসিসের অপর ফল হল জৈবিক (biological); যেমন - কোনো মাছের জনন সংক্রান্ত বিষয় (reproductive fitness) এবং পরিবেশে টিকে থাকার বা বেঁচে থাকার ক্ষমতা (survival fitness) ।

৩) হেটেরোসিসের আর একটি ফল হল শারীরবৃত্তীয় (physiological); যেমন - মাছের অভিযোজন ক্ষমতা (adaptive fitness) এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা।

মাছ চাষে হেটেরোসিসের প্রভাব :

পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, হেটেরোসিসের ফলে মাছের বৃদ্ধি বা বাড়-বাড়ন্ত (growth) সাধারণের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ করা সম্ভব। দেখা গেছে, হেটেরোসিসের ফলে প্রতি জনুতে (each generation) রুই মাছের বৃদ্ধির হার (growth rate) প্রায় ১৭% করে বাড়ে এবং চার জনুর (four generations) পর বৃদ্ধির হার (growth rate) প্রায় ৬৫% বাড়ানো যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে আমরা "জয়ন্তী রুই" (Jayanti Rohu) -এর কথা বলতে পারি।